Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 88-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ: উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনায়

ড. পরমাশ্রী দাশগুপ্ত, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 10.04.2025; Accepted: 17.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We are taught to recognize the East in terms of the dominance and manifestation of power of colonial civilization. Colonialism repeatedly misleads us. The colonial model, ignoring our own stream of literary culture and historical practice, maintains its dominance in all areas. Although the colonial-influenced historical practice and nationalist historical practice began in the 19th century, Bengali had been bearing witness to the sense of history even before that. When the traditional stream of compiled Vaishnava verses was gradually eroding since the 17th century, Vaishnava verse compilers came forward to save the history of Bengal within the cultural heritage by compiling and preserving it. This act of preservation established a sense of responsibility towards tradition in the life of Bengal before colonialism. Despite facing much neglect from the educated people, that stream continued to make and renew its own identity. The initiatives of the 18th and 19th century poets, however, speak differently, which push our conventional ideas from within and create a different history. The article will analyze a neglected trend in various Vaishnava collections of poetry in post-colonial thought.

Key Words: Vaishnava verses, Post colonialism, Dominance, History, Heritage

> 'The relationship between occident and orient is a relationship of power, of domination....'[১]

ঔপনিবেশিক সভ্যতার আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রকাশের নিরিখে প্রাচ্যকে চিনতে শেখানো হয়। উপনিবেশবাদ আমাদের বারবার বিভ্রান্ত করে। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চার নিজস্ব ধারাটিকে উপেক্ষা করে ঔপনিবেশিক মডেল সবক্ষেত্রেই নিজের আধিপত্য কায়েম রাখে। উপনিবেশ প্রভাবিত ইতিহাস চর্চা এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা উনিশ শতক থেকে শুরু হলেও, বাঙালি ইতিহাস বোধের সাক্ষ্য রেখেছিল তার আগে থেকেই। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যবাহী ধারাটি যখন ক্রমক্ষয়িষ্ণু, তখন তাকে গ্রন্থিত ও সংরক্ষিত করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বাংলার ইতিহাসকেই বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন বৈষ্ণব পদসংকলকেরা। এই সংরক্ষণের কাজটি উপনিবেশ পূর্ব বঙ্গ জীবনে ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জন সমাজের বহু উপেক্ষার মুখে দাঁড়িয়েও সেই ধারাটি নিজস্ব সংরূপ নির্মাণ ও নবনির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। উনিশ শতকে শিক্ষিত জনসমাজের রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক প্রণয়কথায় প্রতি বিরাগের এক অন্যতম কারণ মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই প্রণয় কথার বিকৃতি, যা অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে আরও জোরালো রূপ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ভিক্টোরিয়ান রুচিবোধের দ্বারা, যা গৃহীত হয়নি।

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। আউল বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, সাঁই, চূড়াধারী, জাত গোঁসাই এই সব নানা উপসম্প্রদায় বাংলার ধর্মীয় জীবনকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার অভিমুখ বদলে যায়। একদিকে যেমন ধর্ম সাধনার বিকল্প পথ তৈরি হয়, তেমন সাধারণ

জনমানসে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিরাগ স্পষ্ট হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা, বৈষ্ণব ধর্মে অতিরিক্ত যৌনাচারের প্রাধান্য এই বিদ্বেষ আরও গাঢ় করে। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা সমাজের এক প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় বৈষ্ণব পদকর্তারাও তেমন উচ্চমানের সাহিত্যরস সম্পন্ন পদ সৃষ্টি করতেও পারেননি। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার দীর্ঘ সৃষ্টিশীল সমৃদ্ধ ঐতিহ্যেও ভাঁটা পড়তে থাকে। এই সময়ের অনেক বৈষ্ণব পদই পূর্ববর্তীদের অনুকরণ ও অনুরণন হয়ে থেকে যায়। এছাড়াও কিছু পদের অতিরিক্ত অলঙ্কার বাহুল্য তার সাহিত্য রসের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। ভোগবাদে উন্মুক্ত, ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন সেবাইতদের চরম উদাসীনতা, অবহেলা ও সাংগঠনিক দুর্বলতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিপর্যয়ের মুখে চলে আসে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সংকটের মুখে বৈষ্ণব পদগুলি সংরক্ষণের উদ্যোগ এবং তার সংকলন গ্রন্থ নির্মাণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ সাহিত্যিক উদ্যোগ, যার ঐতিহাসিক গুরুত্বও গভীর। ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই কিছু বৈষ্ণব পদকর্তা এই সময় পদ সংকলন গ্রন্থ নির্মাণের কাজ শুরু করে। এর পিছনে ছিল সংকলকদের তীব্র ইতিহাসবোধ, যা উপনিবেশ প্রভাবিত হয়। উনিশ শতকে উপনিবেশের প্রভাবে দেশীয় সাহিত্য সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু হলেও বাংলায় এগুলিই প্রথম উদ্যোগ নয়। বৈষ্ণব পদকর্তারা পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংকলন নির্মাণের কাজ বহুদিন আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন। উপনিবেশ প্রভাবিত ইতিহাসে সেই আলোচনা অবদমিত হয়েছে। বঙ্গবাসীর ইতিহাসবোধের অভাব সেই ডিসকোর্সে প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তাদের উদ্যোগ কিন্তু এক ভিন্ন কথাই বলে, যা আমাদের প্রচলিত ধারণাকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে এক ভিন্ন ইতিহাস তৈরি করে।

এক

বৈষ্ণব পদকর্তাদের এই সংকলন প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাব্য কারণগুলি অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বাংলায় ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের এবং উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে সম্মেলক গানের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। সাধারণ জনসমাজে কীর্তন করার প্রচলন ছিল।চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে। মুরারিগুপ্ত তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে (যা মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত) লিখেছিলেন চৈতন্যদেবের জন্মদিনের দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল, সেই গ্রহণ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের লোক কৃষ্ণকীর্তন করেছিলেন।[২] বাংলায় উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে কীর্তন ও সংকীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ও তাৎপর্য চৈতন্যদেবের প্রভাবেই পরিণতি ও প্রসার লাভ করে। সর্বসাধারণের মধ্যে কীর্তন দ্বারা ভক্তি প্রচার করাই ছিল চৈতন্যদেবের লক্ষ্য। চৈতন্যোত্তর পর্বে খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তম দাস এক নতুন কীর্তন কৌশল প্রবর্তন করেন। নরোত্তম দাসের আমন্ত্রণে বাংলার প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মহান্ত ও তাদের অনুগামীরা এই উৎসবে যোগদান করেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ বা তার কিছু পরে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণবমণ্ডলীর সামনে নতুন গায়ন-পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য নরোত্তম বেশ কিছু খোল- করতাল নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। নরোত্তমের সহযোগীরা সকলেই ছিলেন গীত-বাদ্য-নৃত্য বিশারদ। এদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন দেবীদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস ও গোকুল দাস। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' এবং নিত্যানন্দের 'প্রেম বিলাস'-এর বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায়, আসরে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের পর গাওয়া হয়েছিল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ। খেতুরীতে লীলাকীর্তন উপলক্ষ্যে পদগান সর্বসমক্ষে প্রচারিত হল। নরোত্তম দাস পদগানকে লীলা কীর্তনরূপে আসরে আনলেন প্রণালীবদ্ধ করে। গায়ক, বাদক ও দোহার মিলে যে কীর্তন পরিবেশিত হবে, তার সাঙ্গীতিক কাঠামো নরোত্তম দাস ঠিক করে দিয়েছিলেন। কীর্তন গানের এই যে পদ্ধতি নরোত্তম দাস প্রবর্তন করলেন, তা গরানহাটি বা গড়েরহাটি নামে পরিচিত। গরানহাটি গানের সরলীকৃত রূপ মনোহরসাহী কীর্তন। যার উদ্ভব গরানহাটির কিছুকাল পরেই। খেতুরী মহোৎসবের পর থেকে এই কীর্তন পদ্ধতিগুলি সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই কীর্তনে বিভিন্ন মহাজনপদ রসপর্যায় ও ঘটনাক্রম অনুসারে সাজিয়ে পালা বাঁধা হত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু করে রাধা-কৃষ্ণ লীলার নানা রসপর্যায় এখানে গাওয়া হত। পালাকীর্তনের চলন যত বেড়ে চলল, পালাগুলি পর্যায় অনুযায়ী সাজানো এবং এক জায়গায় করার প্রয়োজনীয়তা ততই উপলব্ধ হতে শুরু করল। গোছানো পুথি এসে সেই প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিল। শুরু হল পদাবলী সংহিতা রচনার যুগ। এই পদাবলী সংগ্রহের কাজ ষোড়শ শতকেই শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র' নামের পদ সংহিতার 'মহাকাবানুসারিণী টীকা'-র সাক্ষ্য অনুসারে বলা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ স্বরচিত পদসমূহের একটি বা একাধিক সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন।[৩]

এরপরেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন মহাজনকৃত প্রাচীন পদসমূহ নিয়ে সঙ্কলিত পদসংহিতা। এই রকম সংকলনের প্রাচীনতম নিদর্শন রামগোপাল দাস (বা গোপালদাস) কর্তৃক সঙ্কলিত 'রসকল্পবল্লী'। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটা সঙ্কলিত হয়। মোটামুটি এই সময়ই গোবিন্দ দাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণ করে 'গোবিন্দরতিমঞ্জুরী' নামে একটি পদাবলী সংকলন তৈরি করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামের সংহিতা সংকলন করেন। এতে পঁয়তাল্লিশ জন পদকর্তার তিনশর বেশি পদ ছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পর রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র' নামের পদ সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। রস পর্যায় অনুযায়ী পঞ্চাশ জন পদকর্তার সাড়ে সাতশোর মত পদ নিয়ে রাধামোহন ঠাকুর এই গ্রন্থ নির্মাণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে এক পদসংগ্রহ প্রস্তুত করেন যার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত পুঁথিতে এক হাজার সাতশো নয়টি পদ পাওয়া গেছে। নরহরি চক্রবর্তীর সমসাময়িক দীনবন্ধুর 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' পদসংকলন গ্রন্থ পাওয়া যায়। এটি আকারে ছোট। এর মধ্যে চল্লিশজন পদকর্তার একানব্বইটি পদ পাওয়া যায়। গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলন। এর মধ্যে একশো ত্রিশ জন পদকর্তার তিন হাজারেরও বেশী পদ আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তিনি এই বৃহৎ কাজটি করেছিলেন। বৈষ্ণব দাসের সমসময়ে বা অল্প পরে দ্বিজ মাধব 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' নামে একটি পদসংহিতা প্রস্তুত করেন। এতে এক হাজার তিনশো চোদ্দটি পদ আছে। এই সময়ই বৈষ্ণব দাসের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাধামুকুন্দ দাস 'মুকুন্দানন্দ' নামের একটি পদসংহিতা প্রস্তুত করেন। এই পদসংকলন গ্রন্থ প্রস্তুতের ধারা বাহিত হয় উনিশ শতকেও। কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর', নিমানন্দ দাসের 'পদরত্নসার', গৌরমোহন দাসের 'পদকল্পলতিকা', নটবর দাসের ' রসকলিকা' এই শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থ। এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয় এক সংকলকের 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু' নামের গ্রন্থের কথা জানা যায়।

পদসংকলনগুলি প্রস্তুত করার আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব পদের শুদ্ধতা রক্ষা করা। এই শুদ্ধতা রক্ষা করার তাগিদ বৈষ্ণব পদকর্তারা অনুভব করেছিলেন। বাঙালি জনমানসে ঐতিহ্যের প্রতি যে টান ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছিল পদাবলী সংকলনের মধ্যে। বৈষ্ণব পদ বহু গায়কের মুখে মুখে নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। গায়কদের উচ্চারণ দোষেও অনেক সময় পদের? ঘটত। অনেক পদের অর্থ বুঝতে না পেরে বা পদ ঠিকমত মনে করতে না পারলে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি মতন শব্দ বসিয়ে দিতেন। ফলে ভুল পাঠ গাওয়া হতো এবং সেই ভুল পাঠই প্রচলিত হয়ে যেত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে রাধামোহন ঠাকুর যখন 'পদামৃতসমুদ্র' সংকলন করেছিলেন তখন সংশ্লিষ্ট পদগুলির বিভিন্ন পাঠান্তর বিচার করে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিকে মনে করায়। এইভাবে পদ সংকলন গ্রন্থ নির্মাণে প্রচেষ্টা ছিল যুগঅতিক্রমী আধুনিক প্রচেষ্টা।

পদসমূহের সংকলকেরা ভক্তি শাস্ত্র বিশারদ রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর সংগৃহীত পদগুলির উপর 'মহাভাবানুসারিণী' নামে বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। পদ সংকলক দীনবন্ধু বিভিন্ন রসের লক্ষণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বৈষ্ণবদাসের গ্রন্থে ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রাঞ্জল ভাবে আলোচিত হয়েছিল। সংকলকেরা অনেকেই ছিলেন পদকর্তা। নিজেদের লেখাও তারা সঙ্কলনে ধরে রেখেছিলেন। রস পর্যায় অনুযায়ী পদ সাজাতে গিয়ে কোথাও উপযুক্ত পদের অভাব চোখে পড়লে নিজেরা পদ রচনা করে তা পূরণ করে দিয়েছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সংকলনের ক্ষেত্রে এটা মনে করা যেতেই পারে। রসশাস্ত্র,কাব্য ও সংগীত তিনটি বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন পদকর্তারা।

দুই

উনিশ শতকে বৈষ্ণব পদ সংরক্ষিত হয়েছে নানা পদ্ধতিতে।

ক. প্রথমত, এই সময় কবিয়ালদের গানের মধ্যে বৈষ্ণব পদের সংরক্ষণ ও বিবর্তন চোখে পড়ে।

খ. দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব পদ সংকলনের ধারায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যেভাবে বৈষ্ণব পদ সংরক্ষিত হয়ে চলেছিল, সেই ধারাটিও এই সময় অক্ষুণ্ন থাকে। পাশাপাশি চলে বেশ কিছু নতুন পদ রচনা।

গ. তৃতীয়ত, বৈষ্ণব পদ পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিবর্তনের কাজটিও এই সময় থেকেই শুরু হয়।

ক. অষ্টাদশ শতকে কবি গানের উৎপত্তি হলেও তা প্রসারিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কবি গানের উৎস বিভিন্ন পুরাণ উপ-পুরাণ,মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসী গান। এর রূপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট দিক বা ধারা দেখতে পাই সখীসংবাদ-গোষ্ঠ-গৌরচন্দ্রী যার মধ্যে অন্যতম এর সঙ্গে সরাসরি বৈষ্ণব পদাবলীর যোগ আছে। কবি গানের অনেক কিছুই কীর্ত্তনযোগ্য পদাবলী সাহিত্য থেকে এসেছে বা কবিওয়ালারা তা সরাসরি পদাবলী সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছে। পদাবলী সাহিত্যের মধ্যেও দূতীসংবাদ, সখী সংবাদ, অক্রূরসংবাদ প্রভৃতি বিষয় কম বেশি পাওয়া যায়। সখীসংবাদ, নারদসংবাদ, উদ্ভবসংবাদ, দূতীসংবাদ প্রভৃতি যা দাঁড়া-কবিগানে পাওয়া যায় তার ও প্রাচীন ঐতিহ্য বৈষ্ণব পদাবলী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে। পদাবলীর বিভিন্ন বিষয় যেমন পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ,নৌকাবিলাস, খণ্ডিতা, অভিসার, মান,কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, কলঙ্ক, কলঙ্কভঞ্জন, বিরহ, মাথুর, প্রেমবৈচিত্র্য, সখীসংবাদেরই অন্তর্গত হল। ফলে দাঁড়া কবিগানের সখীসংবাদ পর্যায় প্রাক্তন বাংলা ও ব্রজবুলী পদাবলী সাহিত্যের উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক সাহিত্যিক রূপ।[৪] বৈষ্ণব পদ এভাবেই সংরক্ষিত ও বিবর্তিত হয়েছে কবিগানের মধ্যে। কবিওয়ালরা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাণ্ডার থেকে পদ আহরণ করেছে আর তার নতুন রূপ দিয়েছে। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থগুলি কিছু সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকবে। উনিশ শতকে কবিওয়ালাদের প্রয়োজনেও এই ধারাটি অব্যাহত থেকে যায় বলে মনে করা যেতেই পারে। বৈষ্ণবীয় উপাদান কবিগানের একটি অংশের মুখ্য বস্তু ছিল এবং এই উপাদানের আকর ছিল বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ সমূহ।

খ. বটতলার প্রকাশনা বাংলা মুদ্রণকে বাংলার বৃহত্তর জনসমাজে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। আদিরসাত্মক বইগুলির বিষয় প্রায় সবই প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাকেই বহন করেছিল। এইসব বইয়ের পাঠকদের কাছে পাশ্চাত্যধর্মী সাহিত্যের থেকেও দেশজ মৌলিক ঐতিহ্য,বুলি অমার্জিত ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, লঘু ঠাট্টা আদিরসাত্মক যৌন অনুষঙ্গ, নীতিকথা এসবই ছিল আগ্রহের ও পছন্দের বিষয়। বাংলা মুদ্রণের জগতে এই অপরিমেয় অবদান ও পাঠক সমাজে বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বটতলার সাহিত্যকে বারেবারেই নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভিক্টোরিয়ান রুচিবোধে আক্রান্ত নানা দেশীয় মানুষও এই সাহিত্যকে অশ্লীল তকমা এঁটে বর্জন করতে প্রয়াসী ছিল। সরকারের তরফ থেকে নানা আইন করেও এই ধরনের বইয়ের বিক্রি বন্ধ করা যায়নি। উনিশ শতকের বিকল্প জনরুচি এই সাহিত্য ধারাকে পুষ্ট করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই কলকাতা ও আশেপাশে এই জাতীয় ছাপাখানা থেকে কমপক্ষে ১৪০০ বাংলা পুস্তিকা ও ইস্তেহার প্রকাশিত হয়। এর এত চাহিদা ছিল যে কোনো কোনো বই ৩০,০০০ এর বেশি ছাপানো হতো। এইসব বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীর মতো কিছু জনপ্রিয় পৌরাণিক উপাখ্যানও ছিল। কীর্তন, কবিগান ইত্যাদির মধ্যে যেমন রাধা-কৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যান স্থান পেয়েছিল তেমনই বটতলার ছাপাখানাতেও রক্ষিত ও নানা ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল রাধা-কৃষ্ণ প্রেম কথা। নবজাগরণের আলোকিত মডেলে আধুনিক বাঙালি ভদ্রলোকের নির্মিত ভাষা,সাহিত্য,গদ্য মান্যতা পেল। এর মধ্যে ছিল উপনিবেশিক ছাপ ও সঠিক ইতিহাসবোদের অভাব। আধুনিক বাঙালি ভদ্রলোকের বাইরে যে বিশাল জগৎ, যেখানে বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নারী, মুসলিম, গ্রাম থেকে আসা অসংখ্য পেশার সাধারণ মানুষ, নিম্নবর্গ - তাদের চিন্তা চেতনার কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনালোকিত চেতনার জগতে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের এক বিশেষ মূল্য ছিল। উনিশ শতকেও বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের ধারাটিও এই জগতেই প্রবহমান ছিল । গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে একশ্রেণীর মানুষের কাছে এই সঙ্কলনের চাহিদা থাকার জন্য বটতলা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল 'পদকল্পলতিকা'।[৫]

পদরসসার, পদরত্নাকর, পদকল্পলতিকা এই সংকলনগুলি মূলত পুঁথি আশ্রয়ী। পরে এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিতও হয়। এক্ষেত্রে বটতলার ছাপাখানা সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে তখনো এই গ্রন্থগুলির বিপুল চাহিদা ছিল। DR.S.K.Sen বৃন্দাবন দাস নামের এক ব্যক্তির 'রসনির্যাস' নামের আরো একটি সংকলন গ্রন্থের কথা জানিয়েছেন। তিনি সম্ভবত শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন, কারণ এই পুঁথিটি তিনি শ্রীখন্ড থেকে সংগ্রহ করেন। এই সংকলনে প্রায় ৪০ জন পদকর্তার পদ সংকলিত হয়েছিল।[৬] সুকুমার সেন তাঁর 'History Of Brajabuli Literature' গ্রন্থে সজনীকান্ত দাসের কাছে রক্ষিত একটি সুপ্রাচীন পদ সঙ্কলনের কথা উল্লেখ করেছেন। পুঁথিটি

পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, এর প্রথম কয়েকটা পাতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই এর নাম জানা যায় না। এই পুঁথির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হতে পারে, তবে অনেকেই এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৭]

উনিশ শতকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন যেখানে বৈষ্ণব পদ সমূহ সংকলিত হয়েছিল তা হল অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরাঙ্গ পদতরঙ্গিনী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদ রতনাবলী। বন্ধু ভদ্রের গৌর পদ তরঙ্গিনী বইটি মূল্যবান কারণ এখানে দেড় হাজার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সংকলিত হয়েছিল। এছাড়াও বিতর্কিত পদ সমুদ্র সংকলন টির কথাও জানা যায়। এই পুঁথিতে পনেরো হাজার পদ ছিল বলে জনপ্রবাদ ছিল। এছাড়াও সতীশ চন্দ্র রায়ের প্রকাশিত পদ রত্নাবলী নামের আরো একটি সংকলন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে প্রকাশিত হয়নি এমন ছয়শোরও বেশি পদ অবলম্বনে তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের সবথেকে শক্তিশালী পদকর্তা হলেন নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত বর্ধমান জেলার মাঢ়োগ্রাম নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী। তিনি সংস্কৃতে গৌরাঙ্গচম্পূ রচনা করেন এবং বাংলায় তোটক ছন্দে অনেক পদ লেখেন। তার রচিত 'গীতিমালা'য় ৪০৯ টি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ আছে। কান্ত ও বীরচন্দ্র নামে দুই পদকর্তার কোনও পরিচয় জানা যায় না কিন্তু এদের পদের ভাষা দেখে? উনিশ শতকের পদকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও বৈষ্ণব পদ সংকলনে এদের পদ নেই। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে প্রভু জগদ্বন্ধু কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হয়েও কেদারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ পদ রচনায় এগিয়ে আসেন।

বিমানবিহারী মজুমদারের 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী' গ্রন্থে উনিশ শতকের পদগুলি সংকলিত হয়েছে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার সংকলিত 'পদরত্নাবলী' বইটি থেকে। এছাড়াও আছে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্নবিলাস', প্রভু জগদ্বন্ধুর 'বিবিধ সঙ্গীত', কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'বিচিত্র বিলাস', সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজীর 'বৈদগ্ধ্য বিলাস', কেদারনাথ দত্ত ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্পতরু', মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামে এক বংশে জন্ম নেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। জীবিকার জন্য তিনি বেশ কিছুদিন ঢাকাতে কাটান। এই সময় পালাগান ও পদ রচনার জন্য তিনি 'বড় গোঁসাই' নামে খ্যাত ছিলেন। বেশ কয়েকটি পালা রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্নবিলাস', 'সুবল-সংবাদ','নন্দহরণ', 'বিচিত্র বিলাস','কালীয় দমন', 'নিমাই সন্ন্যাস'। দুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদিত 'বাঙালির গাত্র' গ্রন্থে তার ২২টি কবিগানের নমুনা পাওয়া যায়।

শিশির কুমার ঘোষ ১৮৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন। সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় তিনি নীলকরদের অত্যাচার নির্ভয়ে তুলে আনেন। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ চালু করার পক্ষে যে কয়জন মানুষ ছিলেন তার মধ্যে শিশির কুমার ঘোষ অন্যতম। 'শ্রী কালাচাঁদগীতি', 'শ্রী নিমাইসন্ন্যাস' তাঁর অন্যতম বই। তাঁর Lord Gauranga গ্রন্থটির মাধ্যমে পাশ্চাত্য গৌরাঙ্গকথার প্রসার ঘটে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'সঙ্কর্ষন দাস' ভনিতায় 'সংগীত রসার্ণব' নামের একটি স্বরচিত পদ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন জনমেজয় মিত্র। এতে তাঁর পিতামহ পীতাম্বর মিত্রেরও কয়েকটি পদ সংকলিত হয়েছিল। বাংলা ও ব্রজবুলিতে প্রায় আড়াইশোটি পদ এখানে সংকলিত হয়।

গ. উপেক্ষা আর অবহেলার মধ্যেই উনিশ শতকে শুরু হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক প্রণয়োপাখ্যানের পুনর্নির্মাণ। বিভিন্ন সাহিত্য সংরূপে নতুন করে শুরু হয় এই পুরাতন প্রণয়কথার প্রয়োগ ও অনুবর্তন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত দুটি একটি বিচ্ছিন্ন পদ, রাজ কৃষ্ণরায়ের নাটক প্রহসনে দুই চারটি ব্রজবুলি পদ, ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেনের 'পদচিন্তামণিমালা' এবং ১২৯১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই অনুবর্তন ও পুনর্নির্মাণের উদ্যোগের মধ্যেও ছিল পদকর্তার প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' এমনই এক পুনর্নির্মাণ। সেখানে রাধা-কৃষ্ণ কথার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল উনিশ শতকীয় মানবিক চেতনা এবং কবির সংস্কারমুক্ত মন। সুতরাং, রাধা সেখানে প্রেমিকা। যে সমাজ ও সংস্কার ছেড়ে, পারিবারিক নিরাপত্তা ত্যাগ করে প্রেমের পথে এগিয়েছে অন্যদিকে প্রেমিকের প্রবঞ্চনা ছাড়া সে কিছুই পায়নি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'জয়দেব' ও 'ব্রজবৃত্তান্ত' এমনই আরো দুটি নতুন নির্মাণ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের

কাব্যবৃত্তের রাধা-কৃষ্ণ কথা নতুন নাম পেয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণী হরণ' এবং 'কংসবধ' নাটকও এর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৮৭৫ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ আধুনিক জনমানসে পুরাতনের গুরুত্বকে নতুন করে বুঝিয়েছিল।

তিন

এই ধরনের নানারকম পুনরুজ্জীবনমূলক উদ্যোগ সত্ত্বেও বৈষ্ণব পদ সংকলন নির্মাণের স্রোত ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। উনিশ শতকের নাগরিক নতুন সাহিত্যের জোয়ারে এই সাহিত্য স্তিমিত প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ক্রমশবিলীন ধারা হিসাবে থেকে যায়। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলকাতার 'সিমলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তনের' উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার মধ্যে বিশুদ্ধ কীর্তন খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত জনসমাজ এ ব্যাপারে আগ্রহীও ছিল না। বিশেষত নব্যশিক্ষিত ইংরেজি জানা বাঙালিরা এই ধরনের কীর্তনগানকে রুচিবর্জিত বলে মনে করত। ঔপনিবেশিক শিক্ষা তাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছিল। যে কীর্তন, কথকতা দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গীয় জনসমাজে শিক্ষা ও বিনোদন দিয়ে গিয়েছিল তা প্রত্যাখ্যাত হল। এই মানসিক আবহাওয়ায় এবং ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রক্রিয়ায় দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের একেবারে কোণঠাসা অবস্থা দেখা গেল।

তবুও প্রচলিত মানসিক আবহাওয়ার উল্টোদিকে কিছু ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা দেখা যায় প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার ও রক্ষণের। যশোরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'মহাজন পদাবলী সংগ্রহ' প্রকাশের উদ্যোগ এমনই ভিন্নমুখী প্রচেষ্টা। ১৮৭০-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, দু'শো ব্যক্তি যদি এই গ্রন্থ একটাকা দামে কিনতে প্রতিশ্রুত হয় তাহলে তিনি 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' নামে বইটি টীকাসহ ছাপতে আরম্ভ করবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রায় দেড় মাস পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় শিশির কুমার ঘোষ সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন যে তিনি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখেছেন, যা খুবই ভালো এবং পাঠকের এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করা উচিত। তাঁর লেখার মধ্যেই প্রকাশিত হয় পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত মানুষের উদাসীনতার প্রসঙ্গ। দুই বছর ধরে সংবাদপত্রে অনেক আবেদন ও অনুরোধের পর শেষ পর্যন্ত ১৮৭২-এ ৩৯৬ পৃষ্ঠার বইটি বের হয়। বিজ্ঞাপনে ও ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহের কথা উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে শুধুমাত্র বিদ্যাপতির পদাবলীই মুদ্রিত হয়েছিল। অনুমান করা যায়, আশানুরূপ গ্রাহক না থাকার জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি।[৮]

জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁর 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহের' একটি লিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারকে উপহার দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশে উৎসাহিত করে। জগদ্বন্ধু ভদ্রের গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার দুই বছর পরে ১২৮১ থেকে ১২৮৩ সালের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। এই বইটির সঙ্গেই তেরো-চোদ্দ বছরের রবীন্দ্রনাথ যখন আন্তরিক যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন, তখন অনেক শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের অগোচরে বা উপেক্ষার অন্তরালেই ছিল এই বইটি।

উনিশ শতকের জন মানসে পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি যে অনীহা ও অবজ্ঞা ছিল, তার বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে বাঁচানোর, রক্ষা করার, যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। গ্রাম বাংলার শিকড়ে, মাটিতে জড়ানো ছড়া খুঁজে বাংলার উপেক্ষিত লোকসাহিত্য শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে আনতে রবীন্দ্রনাথের একই ধরনের উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়ে।

'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' বইটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় করেছেন। ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র সূচনায় তিনি এর উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি বলেছেন, এই বইটিই ছিল তাঁর 'লোভের সামগ্রী'। এই সংযুক্তি ও ভালোলাগার সঙ্গে চিন্তা ও পরিশ্রম যুক্ত হয়ে প্রায় দশ বছর পর প্রকাশিত হয় 'পদরত্নাবলী'। যা উনিশ শতকের এক ব্যতিক্রমী পদসংকলন গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'মহাজন পদাবলী সংগ্রহের' সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা জানা যায় না কারণ তিনি এই গ্রন্থের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। এই গ্রন্থের প্রকাশের সময় তাঁর বয়স মাত্র এগারো বছর ছিল। কিন্তু 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' বইটির উল্লেখ তিনি বিভিন্ন জায়গায় করেছেন। ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সূচনায় তিনি লিখেছেন-

> 'অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যাক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প।....বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেক্স থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।'[৯]

অর্থাৎ দাদাদের ডেক্স থেকে নিয়ে লুকিয়ে পাঠ করে প্রথম পদাবলীর বিশাল রসজগতের সামনে আসেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। মনে করা হয় সেটি ১২৮২ সাল হবে। 'জীবনস্মৃতি'-তেও তিনি উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থটি ছিল তাঁর 'লোভের সামগ্রী'। তিনি এও জানিয়েছেন, গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। ফলত এই বই সংগ্রহ করতে তেমন অসুবিধা হয়নি কবির। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ বইটির পদগুলির প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের সংযুক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে—

> 'গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।'[১০]

এই সংযুক্তি থেকে ভালোলাগা এবং দশ বছর পর সেই ভালোলাগার সঙ্গে মনন-চিন্তা ও পরিশ্রমে সমৃদ্ধ হয়ে যে ফসলটি আসে, তাই 'পদরত্নাবলী', যা উনিশ শতকের এক ব্যতিক্রমী পদসংকলন গ্রন্থ, যার অবস্থান ছিল যুগ চিন্তার বিপ্রতীপে।

> 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশের পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বন্ধুত্ব ও একনিষ্ঠ শ্রম।[১১]

'পদরত্নাবলী' পদগুলো নির্বাচন ও সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন বৈষ্ণব সংকলনগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন। এই গ্রন্থের নিবেদন অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, বটতলার 'পদকল্পতরু' প্রত্যেক সংস্করণে যেহেতু কিছু না কিছু রূপান্তর লাভ করেছে তাই এর চার-পাঁচটি সংস্করণের সঙ্গে শ্রীরামপুরের 'পদকল্পতরু'কে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও সাহায্য পেয়েছেন পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পলতিকা, শ্রীগীতচিন্তামণি থেকে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন—

> 'এ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান সহায়-দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার গুরুকুল শ্রীখণ্ডের মোহান্ত মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত কীটদষ্ট হাতের লেখা পুরাণ পুঁথির রাশি।'[১২]

বহুদিন ধরে দুষ্প্রাপ্য 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ, যা বৈশাখ ১২৯২ সালে প্রকাশিত। 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের নিবেদন অংশেই এই সংস্করণটির অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এ ব্যাপারে নানা উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৩১০ সালের ৩ ভাদ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব দেন। রবীন্দ্রনাথ এর জন্য বৈষ্ণব কবিতা সংগ্রহের একটি খাতাও প্রস্তুত করেছিলেন। এই খাতার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জনার ভার দিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে উল্লেখিত বৈষ্ণব পদসংগ্রহের খাতাটি পুলিনবিহারী সেনের সহায়তায় শ্রীশচন্দ্রের পৌত্র সুকৃতচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করেন বিশ্বনাথ রায় এবং অনাথনাথ দাস। এঁরা দুজনে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে আসেন। পদরত্নাবলীর স্বতন্ত্র দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ এবং প্রথম সংস্করণের পর এই দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়কেই বাস্তবায়িত করেন।[১৩]

চার

উনিশ শতকে যুগপ্রবণতার বিপরীতে গিয়ে 'পদরত্নাবলী'-কে ভিন্নভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বৈষ্ণব পদসংকলনগুলি প্রস্তুত হয়েছিল তার পিছনে ছিল বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রবণতা।

এর সঙ্গেই বৈষ্ণব পদকর্তারা নিজেদের প্রদত্ত গ্রন্থে সংযোজিত ও সংরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকলকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পদকর্তা। তাঁরা তাঁদের স্বরচিত পদ দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণব পদের ধারার সঙ্গে গ্রন্থিত করতে চেয়েছিলেন। আবার এরা প্রত্যেকেই পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসপর্যায় ও তাত্ত্বিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ পদসংকলন গ্রন্থই বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুযায়ী রসপর্যায়ের ভিত্তিতে সাজানো। উনিশ শতকেও সেই ধারা চলে এসেছিল। উনিশ শতকের সংকলকরা বৈষ্ণবীয় প্রচলিত রীতিকেই মান্যতা দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের বৈষ্ণব পদ সংকলনের ধারা মূলত দুই ধরনের। প্রথমত, ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকে কিছু ব্যক্তি বৈষ্ণবপদ সংকলন করেছিলেন, তাঁরা নিজেরা পদকর্তা ছিলেন না। প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক জনমানসের সামনে তুলে আনাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, কিছু পদকর্তা যাঁরা উনিশ শতকেও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় পদ লিখেছিলেন। যাঁদের লেখায় পাওয়া যায় বৈষ্ণবপদের নতুন নির্মাণ বা পুরাতনেরই অনুবর্তন। এঁরা অনেকেই নিজেদের বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। প্রথম ধারার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় প্রচলিত তাত্ত্বিক রূপকে মান্যতা দিয়ে সংকলন প্রস্তুতের ধারা প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে উনিশ শতকেও চলে এসেছিল। 'পদরত্নাবলী' এই ধারার সাহিত্য হয়েও নানা কারণে ব্যতিক্রমী। উনিশ শতকে প্রাগাধুনিক সাহিত্য পাঠে শিক্ষিত সমাজের যে বিরাগ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই 'পদরত্নাবলী'-কে তিনি সাজিয়েছিলেন নতুন কালের উপযোগী করে। 'পদরত্নাবলী' নির্মাণের মধ্যে দিয়ে যে সম্বন্ধে পাঠককেও যেন তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। এই গ্রন্থটিই উনিশ শতক থেকে বৈষ্ণব পদ সংকলনের ধারার অভিমুখটি বদলে দিল। বৈষ্ণব পদ রবীন্দ্র মননে কোনও ধর্মীয় সামগ্রী হয়ে থাকেনি, তার চিরকালীন আবেদন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গী হয়ে ছিল। বৈষ্ণবপদের ধর্ম ভাবনার থেকেও কাব্যরস রবীন্দ্রনাথকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকের নবচেতনার জগতে বৈষ্ণবপদকে পৌঁছোতে হলে তার ধর্মীয় মোড়ক ভেঙে বেরিয়ে আসা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী'-র 'বৈষ্ণব কবিতা'-র মধ্যে সেই মানবিক আবেদনের কথাই লিখেছিলেন। ওই মানবিক চেতনা এবং মানব মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েই নির্মিত হয়েছিল 'পদরত্নাবলী', যা নতুন যুগ প্রেক্ষিতে সংকলন গ্রন্থের নতুন ধারাটিকে নির্মাণ করে দিয়েছিল। 'পদরত্নাবলী'-র অভিনবত্ব—

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল এই সংকলন গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক পদকে প্রথমে স্থান দিয়ে শেষে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকাকে রাখবেন, যা বৈষ্ণবীয় প্রথা বিরোধী। পদবদ্ধ পালাকীর্তনের শুরুতেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা স্থান পায়। একইভাবে সংকলনগ্রন্থেও এই রীতি চলে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই রীতি ভাঙতে চাইলেন। গ্রন্থের নিবেদন অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

> 'রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সমস্ত কবিতা শৃঙ্খলামত বসাইয়া শেষে গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা বসাইবার কল্পনা ছিল।'[১৪]

এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বিমানবিহারী মজুমদারের মতে পদরত্নাবলী প্রথম সংকলন গ্রন্থ যা বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হিসাবে রচিত হয়নি। বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পরিবেশনই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ওই বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন রীতি তৈরি করলেন। কৃষ্ণের জন্ম থেকে বাল্যলীলা হয়ে রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা পর্যন্ত পদগুলিকে তিনি মনস্তাত্ত্বিক ক্রমপরম্পরায় সাজালেন। নবজাত শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাৎসল্যলীলার পদ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সংস্করণের ৪২ নম্বর পদ পর্যন্ত সবই কৃষ্ণকেন্দ্রিক। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোষ্ঠগমন, গোষ্ঠবিহার ও উত্তরগোষ্ঠ সেখানকার মুখ্য বস্তু। ৪৩ নম্বর পদে প্রথম রাধাকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। গোষ্ঠগমনের রাধা জবানিতে বর্ণিত পদটিতে রাধা প্রথম কৃষ্ণকে দেখলেন এবং তার মধ্যে একটি মমত্বের ভাব জন্ম নিল—

"বড়িমাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনাপুলিন বনে, দেখিয়াছি রাখাল সনে
খেলারসে হৈয়াছিল ভোর॥
বংশী-বটের তল, ছায় অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।

রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল
ডোকে আঁখি অরুণ বরণ।।"[১৫]

এবং এর পরেই অর্থাৎ ১৪ নম্বর পদটি রাধার বয়ঃসন্ধির পদ। এরপরে ক্রমেই রাধা ও কৃষ্ণের যৌবনলীলা ক্রমান্বয়ে সজ্জিত ও বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা মানবজীবনের নানা পর্যায়কে তুলে আনে। ধাপে ধাপে যা পদগুলির মধ্যে দিয়ে নির্মিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, পদগুলির শীর্ষে রসশাস্ত্রানুযায়ী শিরোনাম বর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে দিয়ে আবারও তিনি ধর্মীয় ভাবনা এবং প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করলেন। প্রতিটি কবিতার শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এর সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য ও কাব্যরসকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

চতুর্থত, 'পদরত্নাবলী'-র রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদের সমাপ্তি হয়েছে ভাবসম্মিলন বা প্রার্থনার পদ দিয়ে নয়। এক্ষেত্রেও তিনি প্রথা ভেঙেছেন। ২৫০ নম্বর পদে ভাবসম্মিলনের পর ২৫১ নম্বর পদটি রসোদ্গারের। কবিবল্লভ ভণিতায় 'সখি কি পুঁছসি অনুভব মোয়' এই পদটিতে শাশ্বত প্রেমের অনির্বচনীয় মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। রসোদ্গারের পদটি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদবিন্যাসের শেষে রেখে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের থেকেও পদাবলীর মানবিক প্রেমচেতনাকে বেশি গুরুত্ব দিলেন।

নতুন যুগ প্রবণতা অনুযায়ী বৈষ্ণব পদ সংকলন করে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন, সংরক্ষণের পাশাপাশি তার যুগোপযোগী পরিবেশও প্রয়োজন। তিনি পদসংকলন গ্রন্থের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শাশ্বত আবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে উনিশ শতকের মানবিক চেতনাকেই জয়যুক্ত করলেন।

উনিশ শতক থেকে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতির পরম্পরা সংরক্ষণের কাজ চললেও এর সূচনা হয়েছিল উপনিবেশ পূর্ব পর্যায়ে। যে ধারাটা সর্বত্রই উপেক্ষিত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে উনিশ শতকে যে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়, তার পূর্বসূরী এই ধারাটি। অর্থাৎ গোকুলানন্দ সেন, রাধামোহন ঠাকুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে সংরক্ষণ ও পরম্পরা ধরে রাখার কাজটি শুরু করেছিলেন সেই ধারাটিই প্রসারিত হয়েছিল উনিশ শতকে জগদ্বন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র প্রমুখের প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এসে তাঁদের সংকলনের মাধ্যমে এই ধারার বাঁক পরিবর্তন করলেন। ঐতিহ্য সংরক্ষণকে যুগগত চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এই ধারাটির প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে দিলেন। পাশাপাশি পরবর্তী শতকের বৈষ্ণবপদ সংকলন প্রস্তুতের জন্য দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক গড়ে তুললেন। সংকলনের সঙ্গে সৃজনশীলতা মিশ্রিত হয়েছিল বলেই বৈষ্ণবপদ সংকলনের শাশ্বত আবেদনটি ধ্বনিত হয়েছিল।

> 'আজ আমাদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন তত্ত্বকথা বলে ততটা নয় যতটা সাধারণ সাহিত্যরসবাহী গীতিকবিতা বলে।'[১৬]

এই সত্য 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বৈষ্ণব পদসংকলনের ধারার সূচনা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত দেশীয় উদ্যোগে যে ধারার বিস্তার উনিশ শতকে এসে সেই ধারা 'পদরত্নাবলী'র মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

বিশ শতকে সংকলনের এই সৃজনশীল ধারাটিই আরও বলিষ্ঠ হয়, সঙ্গে সংযুক্ত হয় বিদ্যায়তনিক প্রয়োজনে বৈষ্ণব পদসংকলন নির্মাণ চর্চা। সৃজনশীল লেখকদের হাতে এই বৈষ্ণব পদ নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় তত্ত্বকথা নয়, মানবজীবনরসের পরম্পরাই চিরস্থায়ী হয়। পুরনো কথকতা, নতুনভাবে, নতুন রসে আমাদের আনন্দ দিয়ে যায়।

উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনায় সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও ইতিহাসের উপর উপনিবেশের নিয়ন্ত্রণকে দূরে সরানো হয়। পাশ্চাত্যের মডেলে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে নতুন ধারাগুলি এসেছিল, বিদ্যায়তনিক পরিসরে তার আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। এর উপরে উপনিবেশের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আছে। এই বঙ্গীয় দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতির চিরপ্রবহমান ধারা এবং বঙ্গের নিজস্ব ইতিহাস সংরক্ষণের ধারা, যা ইউরোপীয় মডেল থেকে ভিন্ন তার স্বরূপ সেভাবে উন্মোচিত হয়নি। উপনিবেশের প্রভাবমুক্ত সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও বিবর্তনের নানা ধারার নিজস্ব চালচিত্র বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আধিপত্য এই সমস্ত চর্চার অভিমুখকে রুদ্ধ করেছিল।

উপনিবেশের আয়নাতেই আমরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে চিনতে শিখেছি। এডওয়ার্ড সাঈদের 'Orientalism' এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রসঙ্গটিকে তুলে এনেছিল। তিনি বলেছিলেন প্রাচ্যের যে সমস্ত দেশে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ ছিল তাদের ইতিহাসে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ভুল উপস্থাপনের মোড়ক থেকে নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের তাগিদ উত্তর ঔপনিবেশিক পরিসর তৈরি করে। বৈষ্ণব পদ সংকলনের উপেক্ষিত একটি ধারাকে আমরা নতুন করে চিনতে শিখি। বঙ্গীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম এই সংকলন গ্রন্থ যার বিবর্তনও উপনিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করে।

সূত্রনির্দেশ ও মন্তব্য:

১. Edward, W. Said, *Orientalism*, New York, Vintage Books, 1979, p 13

২. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতার পক্ষে কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯, পৃ. ২৪ (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য)

৩. তদেব, পৃ. ১৯২

৪. পাল, ড. প্রফুল্লচন্দ্র (সম্পাদিত), *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব)*, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১, পৃ. ২৭১

৬. তদেব, পৃ. ২৭৩

৭. ওই, পৃ. ২৭৫

৮. '১৯শে চৈত্র তারিখে অমৃতবাজারে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিলেন যে তিনি ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন; উহা খুব সুন্দর হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থের গ্রাহক হইয়া উহার প্রকাশে সাহায্য করা উচিত।....অদ্যাপি যে আমরা ঢপ ও কীর্তন শুনিয়া এত মোহিত হই, তাহার কারণ, এই সমুদায় গীতে তাঁহাদের সৃজিত রসবিন্দু মিশান হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কবিতাতে আধুনিক ঢপ-গায়কেরা শব্দ চাতুরী, অনুপ্রাস প্রভৃতি মিশাইয়াও উহা সম্পূর্ণ বিকট করিতে পারেন নাই।'- বিমানবিহারী মজুমদার, *রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭, পৃ. ২

৯. তদেব, পৃ. ৩

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৭৬

১১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'তখন রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়িয়া পদরত্নাবলী সংগ্রহ করিতেছিলাম, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বৈঠক হইত।' -সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার: বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় প্রস্তাব), পৃ. ৩১

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *পদরত্নাবলী*, পরিবর্ধিত আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ. ৭

১৩. রায়, বিশ্বনাথ, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ; বিদ্যাপতি থেকে ভারতচন্দ্র*, সুজন প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৯৬-১১৭ (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য)

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *পদরত্নাবলী*, পরিবর্ধিত আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ. ৭

১৫. ওই, পৃ. ৪৭

১৬. সেন, সুকুমার (সংকলিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য আকাদেমি , ১৯৫৭, পৃ. ভূমিকা (দশ)